যুগান্তর

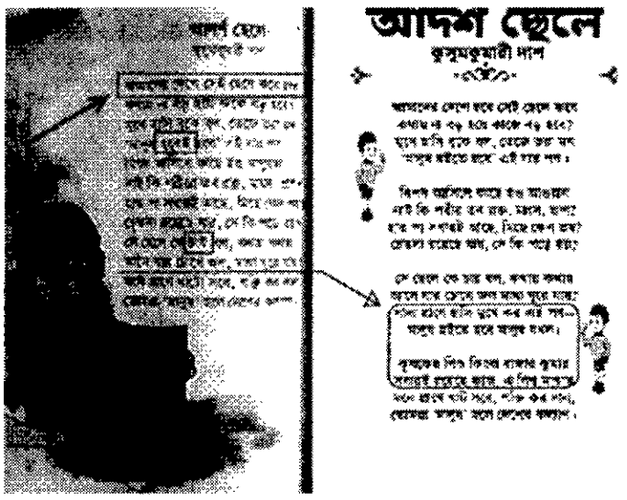

8 FEB 2017

ড. মো. সোহেল রহমান

পাঠ্যপুস্তকে ভুল-অসঙ্গতির প্রকৃত কারণ কী?

সম্প্রতি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে শুরু হয়েছে তুলকালাম। এ নিয়ে চারদিকে অনেক আলোচনা, গরম গরম টকশো আর বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার। এ বিষয়ের দুটো দিক নিয়ে আলাদা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, একটা অনভিপ্রেত কথা এসেছে যে, আমাদের পাঠ্যবইগুলোতে নাকি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্যকর্মগুলো থাকা উচিত নয়; বলা হয়েছে, শতকরা ৯৭ ভাগ মুসলমানের দেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাজ বিবেচ্য হবে কেন? সম্ভবত উগ্র তথাকথিত ইসলামী ভাবধারার কোনো দল বা তাদের মুখপাত্র এরকম কোনো কথা বলে থাকবে বা থাকবেন। তথাকথিত বলছি এ কারণে যে, ইসলামের মূল চিন্তাধারার সঙ্গে তো এটি মেলে না! পাঠ্যবইয়ে কোন্ গল্প বা উপন্যাস থাকবে তা তো লেখকের ধর্ম দিয়ে ঠিক করার কথা নয়! আমাদের পাঠ্যক্রমে কোনো একটি সাহিত্য/কাব্য/গল্প যেসব কারণে যোগ করা হয় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল একজন শিক্ষার্থীর সুস্থ মনন ও মানসিকতা গড়ে তোলা। সম্প্রতি একটি দৈনিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় থাকা অধ্যাপক মাহবুবুল আলম এ বিষয়টি অনেকখানি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, বয়সভেদে কোন্ স্তরের শিক্ষার্থী কী শিখবে, কোন্ বিষয়গুলো তার জন্য উপযুক্ত এবং তার ধারণক্ষমতা কতটুকু— এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে একটি শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়, যার ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যবইগুলো লেখা হয়। এখন সেখানে একটি সাহিত্যকর্মের লেখকের ধর্ম বিবেচ্য হবে কীভাবে? একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী লেখকের গল্প যদি এ ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী বলে মনে হয়, তবে একশ'বার তা-ই থাকা উচিত। একটা খুব সহজ উদাহরণ দেই— ছোটবেলার শোনা সেই ঈশপের গল্পের কথা কি মনে আছে? প্রতিটি গল্পেই রয়েছে কোনো না কোনো নৈতিকতার শিক্ষা। ঈশপকে মনে করা হয় প্রাচীন গ্রিসের একজন গল্পকথক। যদিও তিনি আসলেই ছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্ক আছে; তবে তিনি যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, তা নিয়ে বোধহয় কোনো তর্ক নেই। তাহলে কি আমরা আমাদের কোমলমতি শিশুদের ছোটবেলায় এ গল্পগুলো আর বলব না শুধু এ কারণে যে, ঈশপ মুসলমান ছিলেন না? অবস্থাদৃষ্টে আমার মনে হয়, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যখন মুসলমান লেখকদের মধ্যেও কে ভালো মুসলমান তা বিবেচনাপূর্বক তাদের সাহিত্যকর্ম পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি নিয়ে কোনো একটি দল হাজির হবে! আসলে আমরা কীভাবে যেন আমাদের সন্তানদের মধ্যে সেই ছোটবেলা থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছি। আর সম্ভবত এরই একটি উপজাত হল আমাদের আজকের অস্থির তরুণ সমাজ, যারা অনেকটাই আমাদের অচেনা!

আমাদের আসলে ভাবতে হবে, বছরের প্রথম দিন ভুলেভরা বই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেয়া বেশি গুরুত্ববহ নাকি যে বইগুলো পড়ে আমাদের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা বড় হবে সেগুলো ত্রুটিমুক্ত হওয়া বেশি দরকার? আমরা কি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পাঠ্যবই পরিমার্জনাসহ ছাপানোর পুরো প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কোনো ধাপ বাদ দিয়ে ফেলেছি?

এবারে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। অবধারিতভাবেই যে বিষয়টি খুব গুরুত্ব নিয়ে আলোচনায় এসেছে তা হল পাঠ্যপুস্তকের ভুল ও অসঙ্গতি। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের যদি আমরা প্রথম থেকেই ভুল জিনিস শেখাতে থাকি তাহলে তারা বড় হয়ে কী করবে? দেখা যাচ্ছে, বানান থেকে শুরু করে বাক্যগঠন কিংবা কোনো কবিতার পঙ্ক্তি পরিবর্তন ইত্যাদি অনেক ভুল ও অসঙ্গতি আমাদের সামনে দৃশ্যমান। এর পেছনের মূল দায়-দায়িত্ব কার বা কাদের ওপর বর্তায়? আমরা নিশ্চিত জানি, পাঠ্যপুস্তকগুলো তো মুখের কথায় তৈরি হয়ে যায় না। এর পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া কাজ করে। অনেক পর্যায় পার হয়ে এসে পাঠ্যপুস্তকের চূড়ান্ত সংস্করণ ছাপা হওয়ার কথা। এখানে প্রাথমিকভাবে সম্পৃক্ত থাকেন মূল লেখক-লেখিকারা, যারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো বিদ্যালয়, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা শিক্ষক-শিক্ষিকা। পরবর্তী ধাপে থাকেন সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞরা। সম্পাদনার পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের আরও ধাপ থাকতেও পারে, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে যা সম্পর্কে আমার বিস্তারিত ধারণা নেই। যদি কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনার প্রয়োজন হয়, তবে নিশ্চয়ই তা কতগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হওয়ার কথা। কিন্তু পত্র-পত্রিকা মারফত জানা যাচ্ছে, এ বছরের পরিমার্জনার বিষয়টি হয়তো যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে করা হয়নি। সেক্ষেত্রে কেন এমন হল তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

একজন অভিভাবক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সমন্বয়ের অভাব আরেকটি বড় সমস্যা। এবং সেটি শুধু এ বছরেই সীমাবদ্ধ নয়। সাম্প্রতিককালে আমাদের বাংলা বানানে বেশকিছু পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি। যেমন— হ্রস্ব ই (ই) এবং দীর্ঘ ই (ঈ)-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অনেক বানানেই দীর্ঘ ই (ঈ)-এর ব্যবহার উঠে যাচ্ছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখবেন, বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ে এ বানানগুলো বিভিন্নভাবে রয়েছে, হয়তো বাংলা বইয়ে একরকম আর সমাজপাঠ বইয়ে আরেক রকম। সুতরাং, আমার মেয়ে যখন আমাকে এসে বলে, বাংলা বইয়ে বাড়ি বানান হ্রস্ব ই (ই) দিয়ে এবং সমাজপাঠ বইয়ে বাড়ী বানান দীর্ঘ ই (ঈ) দিয়ে— এখন আমি পরীক্ষায় কোন্‌টা লিখব? আমি তখন একটু হতচকিত হয়ে ভাবি, বাংলা পরীক্ষায় লিখতে হবে হ্রস্ব ই দিয়ে আর সমাজপাঠ পরীক্ষায় দীর্ঘ ই দিয়ে! কিন্তু এটা তো মোটেই কোনো সমাধান নয়। এটা একটামাত্র উদাহরণ দিলাম; কিন্তু এ রকম আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের বিভ্রান্ত করে ফেলছি, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমরা টের পাচ্ছি আমাদের সমাজের নানা বিভ্রান্তির মাঝে।

এমনকি একটি পাঠ্যবইয়ের সার্বিক সম্পাদনার মধ্যেও সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোয় মনে হয়েছে, লেখক যা ভেবে বই লিখেছেন এবং পরবর্তী সময়ে একজন আঁকিয়ে যা ভেবে সেই লেখার সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি বইয়ে যোগ করেছেন— তার মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। আবার কোথায় কোন্ ছবি উপযুক্ত তা নিয়েও চিন্তাভাবনার অভাব স্পষ্ট। তাই ছাগলকে দেখা যাচ্ছে আম গাছে ওঠার চেষ্টা করতে সম্ভবত আমের খোঁজে! উদাহরণ হিসেবে কী ব্যবহার করা উচিত তার পেছনেও চিন্তাভাবনার তেমন ছাপ নেই বললেই চলে!

আসলে আমার মনে হয়, আমরা হয়তো সঠিক বিষয়গুলো সঠিক গুরুত্ব সহকারে দেখি না এবং সঠিক জায়গায় সঠিক ব্যক্তিটিকেও রাখি না। অনেক সময় গৌণ বিষয়গুলো আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মূল বিষয়ে আমরা ভুল করে বসি। আমাদের আসলে ভাবতে হবে, বছরের প্রথম দিন ভুলেভরা বই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেয়া বেশি গুরুত্ববহ নাকি যে বইগুলো পড়ে আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা বড় হবে সেগুলো ত্রুটিমুক্ত হওয়া বেশি দরকার? আমরা কি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পাঠ্যবই পরিমার্জনাসহ ছাপানোর পুরো প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কোনো ধাপ বাদ দিয়ে ফেলেছি? নিশ্চয়ই সে রকম কিছু একটা হয়েছে, তা না হলে এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের অনেকে কেন এ বছরের পরিমার্জনার বিষয়ে কিছুই জানতেন না?

ড. মো. সোহেল রহমান : *অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়*
sohel.kcl@gmail.com